দ্বিমাসিক
মঙ্গলবার্তা
১২শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা জুলাই-আগষ্ট ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ

খ্রীষ্টীয় জীবন
গঠনের পত্রিকা

প্রকাশক ও সম্পাদক ঃ
যোসেফ বিশ্বাস

সহ-সম্পাদক ঃ
ফাঃ পিও মান্ডেভি, এস.এক্স.
ফাঃ বাবলু সরকার

সার্কুলেশন ঃ
দাউদ মণ্ডল

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৭৫ টাকা

সম্পাদকীয়

প্রচারকার্য ও ধর্মশিক্ষাদান

ধর্মশিক্ষার নবায়নের জন্য দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভায় আহবান জানানো হয়। এই আহবানেরই ফলশ্রুতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সার্বজনীন মাণ্ডলিক দলিল প্রকাশিত হয়েছে, যেমন :

১। ধর্মশিক্ষাদানের সাধারণ নির্দেশনা (GCD,1971)
২। বয়স্কদের খ্রীষ্টীয় দীক্ষা পদ্ধতি (RCIA, 1972)
৩। আধুনিক জগতে মঙ্গলসমাচার প্রচারকার্য বিষয়ক (১৯৭৫) পোপ ষষ্ঠ পলের প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র "খ্রীষ্টাদর্শ প্রচার" (Evangeli Nuntiandi)।
৪। এ যুগে ধর্মশিক্ষাদান বিষয়ক (১৯৭৯) পোপ দ্বিতীয় জন পলের প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র "ধর্মশিক্ষার হস্তান্তর" (Catechesi Tradendae)।
৫। "কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা" (১৯৯২) পোপ দ্বিতীয় জন পলের পরিচালনায়, ধর্মশিক্ষার নবায়নের জন্য।
৬। খ্রীষ্টধর্মশিক্ষার সাধারণ নির্দেশনা (GDC, 1997), যা হচ্ছে বিশ্বজনীন মণ্ডলীর জন্য ধর্মশিক্ষামূলক সেবাকাজের একটি সারসংক্ষেপ।
৭। সাম্প্রতিক সময়ে, আরও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, একটি ধর্মশিক্ষা বিষয়ক সহায়িকা হিসেবে 'কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা'র সহচর (২০০৫)

সমগ্র মণ্ডলীর জন্য পরিকল্পিত এ সকল মাণ্ডলিক দলিল আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় ধর্মশিক্ষা নির্দেশনার জন্য অনুপ্রেরণা ও ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এ দলিলগুলো মূলত ধর্মপ্রদেশে, ধর্মপল্লীতে ও স্কুলগুলিতে যাদের উপর ধর্মশিক্ষাদানের দায়িত্ব তাদের জন্য। মঙ্গলসমাচার প্রচারের লক্ষ্যে মণ্ডলীর প্রেরণদায়িত্বে নিয়োজিত সকলের নিকট এগুলো সহায়ক বলে মনে হবে। নির্দেশাবলী, যেগুলোর লক্ষ্য ধর্মশিক্ষার অবিরাম নবায়ন, এগুলো ধর্মশিক্ষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কাজ, মৌলিক বিষয়বস্তু ও শিক্ষাপদ্ধতি তুলে ধরে। জাতীয় ধর্মশিক্ষার নির্দেশনা তাদের সকলের আশা ও উৎসাহদানের একটি উৎস, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্মশিক্ষামূলক সেবাকাজে অংশগ্রহণ করে – এটা ঈশ্বরের উপর তাদের নির্ভরশীলতাকে জোরদার করবে, তাদের বুঝতে সাহায্য করবে কিভাবে 'পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা' ঈশ্বর সকলের নিকট পরিত্রাণের বার্তা পৌঁছে দিতে তাদের মধ্য দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। □

সম্পাদক কর্তৃক ২৪/সি, আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং
জেরী প্রিন্টিং, ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।

পাঠ ১

বাংলাদেশে সুসমাচার প্রচার ঃ
খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষার সাধারণ নির্দেশনা (GDC) ভিত্তিক দশ পাঠ

[হিন্দু পটভূমি - মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাস্তবতা এবং অনেক খ্রীষ্টীয় ভাইবোন]

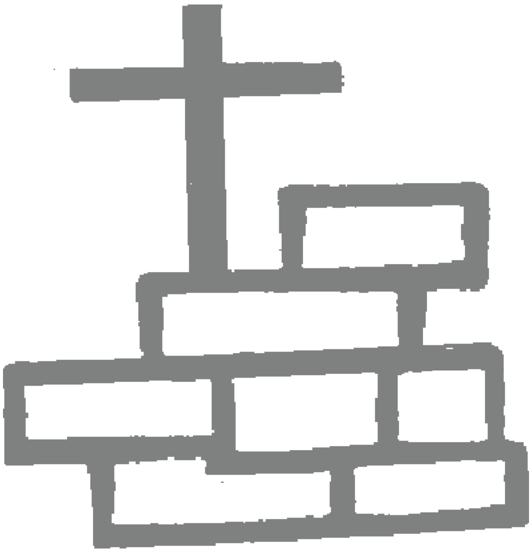

কাটেখিষ্টগণ খ্রীষ্টীয় বার্তাকে অবশ্যই যে বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে এটা তারা ঘোষণা করেন তার প্রেক্ষিতে বিবেচনা করবেন। ধর্মশিক্ষাদান কার্যক্রম অপরিহার্যভাবে সম্পাদিত হয় ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে।

পবিত্র আত্মাই বাণীপ্রচারের প্রধান কর্মী, তিনিই ঐশবাণী এবং জগত জুড়ে অনেক বিচিত্র ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে মিলন-সাক্ষাৎ সম্ভব করে তোলেন।

প্রথম পাঠে আলোচনা করা হয়েছে বর্তমানে বাংলাদেশে ধর্মশিক্ষাকে প্রভাবিতকারী সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে :

১ - বাংলাদেশী সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ, ২ - বাংলাদেশী সংস্কৃতিতে বিভিন্নতা, ৩ - বাংলাদেশ কাথলিকদের চিত্র, ৪ - বাংলাদেশে পরিবার ও গৃহ।

বাংলাদেশী সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

পরিবার দিয়ে শুরু ক'রে সকল প্রতিষ্ঠানে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে ক্ষমতা বন্টনে কর্তৃপক্ষীয় (hierarchical) নির্ভরশীলতার কারণে এখানে সীমিত স্বাধীনতা বিদ্যমান। সর্বস্তরে বিদ্যমান শোষণের ন্যায় এখানে অনেক বিকৃত ঘটনা ঘটে। কাজেই এখানে একজন মুখোমুখি হয় দুর্নীতির। দুর্নীতি সকল স্তরকে গ্রাস করেছে। প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি-কাউকে বিশ্বাস নেই। ব্যক্তিগত পদমর্যাদা বৃদ্ধি ও জীবিকা অর্জনে, ধর্মেরও অপব্যবহার ঘটতে পারে।

মুসলিম দেশে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা খুবই সীমিত, অনেক সময় নিপীড়ন ও হয়রানির নানা ঘটনা ঘটে আর থাকার অধিকার অস্বীকার করা হয়। পরিস্থিতিটা সংখ্যালঘু, অন্যদের অবিশ্বাস এখানে প্রকট। খ্রীষ্টান হওয়ার ইচ্ছা কেউ ব্যক্ত করলে সাধারণত মেনে নেওয়া হয় না, আর সন্দেহ করা হয় : যারা খ্রীষ্টান হতে চায়, তারা শুধু তাদের স্বার্থের পেছনে ছোটে, তারা লাভ চায়, তারা পড়াশোনা করতে চায়; তারা খ্রীষ্টীয় সমাজকে 'বিপদের' মধ্যে 'ফেলতে' পারে। খ্রীষ্টীয় সমাজ এখানে খুবই সীমিত পরিসরের, কারোর খ্রীষ্টীয় সমাজভুক্ত হওয়াকে সুনজরে দেখা হয় না। কেউ খ্রীষ্টীয় সমাজভুক্ত হলে খ্রীষ্টানরা খুবই অস্বস্তি বোধ করে। অনেক ভ্রান্ত ধারণা কাজ করে।

'দরিদ্রতার' পরিস্থিতির মধ্যে জনগণের বসবাস; বাংলাদেশ একটি 'উদীয়মান' দেশ। এখানে দরিদ্রদের প্রতি সুস্পষ্ট 'শোষণের' ঘটনা ঘটে। দরিদ্রের অধিকাংশ অশিক্ষিত। তাদের স্থায়ী কোন কাজ নেই। নিজেদের স্বাস্থ্যের যথাযথ সেবা তারা নিতে পারে না। ৫০ ভাগের অধিক মানুষ মূলত ভূমিহীন। এখানে জীবন মানে বেঁচে

থাকার সংগ্রাম। সমাজে তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অনেকে পড়াশোনা করার সুযোগ খোঁজে, একটা ভাল কাজ পাওয়ার সন্ধানে থাকে।

লোকে নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য হয়, তাদের বেশী সুযোগ-সুবিধা নেই। এখানে লক্ষ্য করা যায়, 'স্বজনপ্রীতির' মত ঘটনা। নিয়োগদানের ক্ষেত্রে সাধারণত একই গোত্রের মানুষ (আত্মীয়স্বজন) প্রাধান্য পায়। চাকরী পাওয়ার ক্ষেত্রে "জানাশোনা ব্যক্তি" থাকতে হয়, যিনি চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেবেন, এক্ষেত্রে চাকরি পাওয়ার শর্তে বড় মাপের প্রতিদান চাওয়া হয়। এখানে 'গুণ' নয়, কিন্তু সম্পর্কই অনেক বেশী বিবেচিত হয়।

নগরায়ন একটি বড় সমসাময়িক সমস্যা, কেননা লোকেরা গ্রাম–যেখানে তাদের সংখ্যা অনেক বেশী–থেকে শহরে পাড়ি জমায়। শহরে এসে তাদের পক্ষে কাজ পাওয়া বেশ কঠিন। "বস্তি" জীবন অত্যন্ত দুর্বিসহ। বস্তি জীবনের অপর নাম বেঁচে থাকার সংগ্রাম।

১। অনেক দলের মধ্যে রয়েছে বিভিন্নতা (জাতি, আদিবাসী, অঞ্চল)

আমাদের মধ্যে থাকতে পারে হিন্দুদের ন্যায় (তারা জাত বা বর্ণের ভিত্তিতে বিভক্ত) বর্ণ বা জাত বিভক্তি। মুসলমান ও খ্রীষ্টানরা 'জাত বা বর্ণ' নিয়ে প্রকাশ্যে কথা না বললেও, মূলত তারা সবাই একই পাড়ায় বসবাস করে, আর একই জাতিসত্তার মানুষ (শ্রেণী, জাত, অঞ্চল)। এক ধরনের কম-বেশী গোপন জাত বিভক্তি এখনো সক্রিয়।

২। খ্রীষ্টানরাও বিভক্ত (বিভিন্ন দল, ধর্ম সম্প্রদায়, আঞ্চলিক বিভিন্নতা)

বাংলাদেশ মণ্ডলীতে বিভক্তি লক্ষ্য করা যায়। এখানকার প্রধান খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়গুলো মূলত প্রোটেস্ট্যান্ট। তাছাড়া, এ সকল সম্প্রদায় অন্যান্য খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় থেকে সদস্য সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সদস্য সংগ্রহের কৌশলটি হচ্ছে, ভাল সুযোগ-সুবিধা প্রদান। ফলশ্রুতিতে অনেক খ্রীষ্টান তাদের অর্থনৈতিক সুবিধা ভেদে বিভিন্ন 'মণ্ডলী' অদলবদল করে বেড়ায়।

৩। কাথলিকরা বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত (আঞ্চলিক বিভিন্নতা)

সাধারণত বাংলাদেশে খ্রীষ্টান জনগোষ্ঠীর অর্ধেক হচ্ছে আদিবাসী জনগোষ্ঠী। বাকি অর্ধেক, খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রাচীন পর্তুগীজ ধর্মান্তরিত (৫০০বছর), হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান, বিগত শতকে। অন্য যারা মুসলিম ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত, তাদেরকে মণ্ডলীতে গ্রহণ করা হয়েছে একশ' বছরেরও বেশী আগে। বর্তমানে এখানে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরণের কোন ঘটনা ঘটছে না। এখানকার খ্রীষ্টীয় সমাজ স্বাভাবিক বংশ বিস্তারের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪। বাংলাদেশে কাথলিকদের চিত্র (২০০৫)

১৪০ মিলিয়ন জনসংখ্যার মুসলিম (৮৮%) ও হিন্দুদের (১২%) মধ্যে কাথলিকদের সংখ্যা খুবই ক্ষুদ্র (২,৭৫,০০০)। এখানে রয়েছে ৬টি ধর্মপ্রদেশ এবং ৭০টি ধর্মপল্লী। দেশী পুরোহিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশী সিস্টারদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। বিদেশী ফাদার-সিস্টারদের বয়স বাড়ছে আর সংখ্যায় কমে যাচ্ছে।

৫। বাংলাদেশে পরিবার (বাড়ি)

কাথলিকদের বৈবাহিক জীবন এখনো পর্যন্ত ভাল, তবে সঙ্কটের নানা চিহ্ন রয়েছে, বিশেষ করে যারা শহরে পাড়ি জমায় তাদের মধ্যে, কেননা তারা তাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগাযোগহীন হয়ে পড়ে আর জীবনটা ভিন্ন এবং অনেক কঠিন। বিভিন্ন কারণে অসুবিধার মধ্যে থাকা 'পরিবারগুলোকে' সাহায্য করার প্রচেষ্টা খ্রীষ্টীয় সমাজের তরফ থেকে লক্ষ্য করা যায়।

৬। সামাজিক পরিবর্তনের মূলে আধুনিক বিভিন্ন ধারা সক্রিয়

সামাজিক পরিবর্তনের মূলে সক্রিয় চার আধুনিক ধারা, যেগুলোর খ্রীষ্টীয় উপায়ে সমাধান প্রয়োজন :

(ক) মানব জীবনের প্রতি সম্মান, যা গর্ভপাত ব্যবস্থা অবলম্বনের, প্রাক-গর্ভনিরোধক মন-মানসিকতার, বয়স্কদের মধু-মরণের (স্বেচ্ছা) মুখোমুখি।

(খ) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বন্ধন ব্যক্তিগত ভাবনার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

(গ) সন্তানদের উপর পিতামাতার প্রাকৃতিক অধিকার বিকৃত স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বাধীনতার মুখোমুখি।

(ঘ) পরিবারের মধ্যে প্রচলিত মূল্যবোধগুলোর প্রসার লৌকিক সংস্কৃতির এবং পাড়ি জমানো পরিবারগুলোর স্থানান্তরের মুখোমুখি।

পাঠ ২

মণ্ডলীর বাণীপ্রচার প্রেরণদায়িত্বের মধ্যে ধর্মশিক্ষার স্থান

বাণীপ্রচারের জন্যই মণ্ডলীর জন্ম। বাণীপ্রচার মণ্ডলীর পরিচয় প্রকাশ ও তার প্রতিষ্ঠাতা যীশু খ্রীষ্ট কর্তৃক তার উপর ন্যস্ত প্রেরণদায়িত্ব সম্পন্ন করে। ধর্মশিক্ষা হচ্ছে, বাণীপ্রচার প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়।

পূর্ণাঙ্গ, ধারাবাহিক শিক্ষা এবং খ্রীষ্টীয় সমাজের জীবনের সঙ্গে প্রারম্ভিক পরিচিতির মাধ্যমে এবং উপাসনা, সংস্কারসমূহ ও সেবাকাজের মাধ্যমে, খ্রীষ্টের দেহরূপ মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যা হিসেবে ধর্মশিক্ষা বিশ্বাসীকে দৃঢ় ও বলীয়ান করে তোলে।

প্রতিটি প্রজন্মের নিকট সুসমাচার প্রচারে খ্রীষ্ট মণ্ডলী এর সকল সদস্য-সদস্যাকে আহ্বান জানায়। খ্রীষ্টভক্তগণ বাণীপ্রচার কাজ সম্পন্ন করে (ক) খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস ঘোষণার মাধ্যমে, (খ) উপাসনা-অনুষ্ঠানে খ্রীষ্টীয় রহস্যগুলোর উদ্‌যাপনের মাধ্যমে, (গ) খ্রীষ্টীয় জীবন পথকে বরণ করে নেওয়ার মাধ্যমে, এবং (ঘ) প্রার্থনার মাধ্যমে। ধর্মশিক্ষা হচ্ছে, বাণী প্রচার প্রেরণদায়িত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়।

১। প্রত্যাদেশ

প্রত্যাদেশ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর ঐশ জীবন সহভাগিতা করার এবং পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা হিসেবে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলনাবদ্ধ করার লক্ষ্যে নিজেকে আমাদের নিকট ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ করেন। এই উপায়ে, ঈশ্বর জগতের পরিত্রাণের জন্য তাঁর প্রেমময় পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দান করেন, আর আমরা যেন তাঁকে জানার, ভালবাসার ও সেবা করার তাঁর আহ্বানের প্রতি সাড়া দিই, সেজন্য বিশ্বাসের দানের মাধ্যমে তিনি আমাদের যোগ্য করে তোলেন।

সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে ঈশ্বরই প্রথম নিজেকে প্রকাশ করেছেন, যে সৃষ্টিকর্মকে তিনি এর চূড়ান্ত পূর্ণতার লক্ষ্যে ধারণ ও পরিচালনা করেন। ইতিহাস নিজেও ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, বিশেষ করে ইস্রায়েলের সঙ্গে সম্পাদিত ঈশ্বরের বিভিন্ন সন্ধিতে, যখন তিনি একটি জাতি হিসেবে তাদের গঠন করেছিলেন। রাজা দাউদের সঙ্গে সম্পাদিত সন্ধির পূর্ণতার লক্ষ্যে, ঈশ্বর মুক্তিদাতাকে প্রেরণের এবং চিরকালের জন্য তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

তবে প্রত্যাদেশ এর চূড়ান্ত পূর্ণতা লাভ করে যখন পরম বাণী মা মারীয়ার গর্ভে রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে আমাদেরই মধ্যে বসবাস করলেন। যীশু খ্রীষ্ট প্রত্যাদেশকে সম্পূর্ণতা ও পূর্ণতা দান করেছেন তাঁর কথা, কাজ, অলৌকিক নিদর্শন ও আশ্চর্য কাজের মাধ্যমে, সর্বোপরি, তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা এবং তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে চিরকাল থাকার জন্য পবিত্র আত্মাকে প্রেরণের মাধ্যমে।

২। বাণী প্রচার ও বাণীর রহস্য

মণ্ডলীর সকল সদস্য-সদস্যা জগতের বুকে নতুন বাণীপ্রচার কার্যে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত হওয়ার জন্য আহূত। এই **নতুন বাণীপ্রচারের** সঙ্গে জড়িত ধর্মশিক্ষাদান কাজে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত হওয়ার লক্ষ্যে, একটি সত্যিকার খ্রীষ্টীয় আধ্যাত্মিকতাকে জীবনের ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকসমূহে সমন্বিত করার লক্ষ্যে, সামাজিক ন্যায্যতার অনুকূলে কাজ করার লক্ষ্যে, সকলকে উদ্বুদ্ধকরণ। নতুন বাণীপ্রচার মানব পরিবারের প্রত্যেক সদস্য-সদস্যা এবং সমসাময়িক সংস্কৃতির প্রতিটি দিক অভিমুখেও চালিত : লক্ষ্য খ্রীষ্টেতে তাদের সকলকে দীক্ষিত করা, যারা আগে কখনো

মঙ্গলসমাচার শোনেনি বা বোঝেনি; খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস সরাসরি ঘোষণা করার এবং খ্রীষ্টেতে রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্যে নিজেদের উন্মুক্ত করার জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করা।

বাণীর সেবাকাজ হিসেবে বাণীপ্রচার চার ধাপে বাস্তবায়িত হয় :

২.১) প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে 'বাণীপ্রচার' সাধারণত যাদেরকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয় তাদের মৌলিক মানব চাহিদার উপর নির্ভরশীল : খাদ্য, আশ্রয়, ভালবাসা, নিরাপত্তা এবং গ্রহণ। এরপর, বাণী এমনভাবে ঘোষণা করা হয় যেন তা শ্রোতৃমণ্ডলী বুঝতে পারে, অর্থাৎ অন্যান্য ধর্মীয় ঐতিহ্যের সদস্য-সদস্যা, যারা ধর্মীয় দিক থেকে উদাসীন, ঈশ্বর অবিশ্বাসী, খ্রীষ্টান ছেলেমেয়ে, অপর্যাপ্ত ধর্মশিক্ষা প্রাপ্ত খ্রীষ্টান, এবং যে সকল খ্রীষ্টান খ্রীষ্টীয় জীবন অনুশীলন করে না।

২.২) পরবর্তী ধাপ, 'সূচনা পর্যায়ের ধর্মশিক্ষা', খ্রীষ্টীয় সমাজের জীবনের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় দীক্ষাপ্রার্থীদের, ছেলেমেয়েদের আর যারা ন্যূনতম ধর্মবিশ্বাস জ্ঞানের অধিকারী তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। সূচনা পর্যায়ের ধর্মশিক্ষা ধারাবাহিক শিক্ষা, সংস্কারীয় জীবন ও উপাসনার সঙ্গে প্রারম্ভিক পরিচয়, এবং স্থানীয় মণ্ডলীর পালকীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে এক নতুন জীবনধারা লালন করে।

২.৩) এরপর, 'দীক্ষাস্নান পরবর্তী' ধর্মশিক্ষার (mystagogy) লক্ষ্য হল, খ্রীষ্ট তথা মণ্ডলীর সঙ্গে খ্রীষ্টভক্তগণের সম্পর্কের সম্প্রসারণ ও বলীয়ান। খ্রীষ্টানদেরকে গভীর ধ্যানচিন্তা, ধর্মশিক্ষা ও প্রার্থনার মাধ্যমে উপাসনায় সক্রিয় অংশগ্রহণকে ঘিরে গভীর জ্ঞান এবং একটি প্রেম ও ন্যায্যতার জীবনের দিকে চালিত করা হয়।

২.৪) 'চলমান ধর্মশিক্ষা কার্যক্রম' খ্রীষ্টভক্তের খ্রীষ্ট ও মণ্ডলী জ্ঞানকে যেমন গভীর করে, তেমনি বিশ্বাসের সত্যসমূহের জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে সাহায্যও করে, যেমন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনীতি।

এই ধর্মশিক্ষা উপাসনিক কিংবা শিক্ষামূলক পরিমণ্ডলে সম্পাদিত হতে পারে। উপাসনা বিষয়ক ধর্মশিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তি ও মণ্ডলীর জীবনে সংস্কারগুলোর অর্থ ও প্রভাবকে আলোকিত ও ব্যাখ্যা করা। সংস্কারীয় চিহ্ন, প্রতীক ও ক্রিয়ানুষ্ঠানসমূহের উপর আলোকপাত উপাসনা-অনুষ্ঠানকে, বিশেষত পবিত্র খ্রীষ্টযাগ উদ্‌যাপনকে গভীরতর ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে।

বাণীপ্রচারের প্রেক্ষিত সমৃদ্ধ ও বিচিত্র। যেন আমরা সুসমাচারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মূল্যবোধগুলো অনুসারে জীবনযাপন করতে এবং সুসমাচারের পরিপন্থী মূল্যবোধগুলো প্রত্যাহার করতে পারি, সেজন্য একটি খ্রীষ্টীয় জীবনধারায় অবিরাম মন ফেরানো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমসাময়িক বাংলাদেশ পরিস্থিতি **মণ্ডলীর সকল সদস্য-সদস্যার জন্য চলমান ধর্মশিক্ষা কার্যক্রম** দাবি করে।

৩। ধর্মশিক্ষার উৎস ও উৎসসমূহ

যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত ঐশবাণীই ধর্মশিক্ষার উৎস। পবিত্র শাস্ত্র ও পরম্পরাগত শিক্ষায় নিহিত এই জীবন্ত উৎস থেকেই সকল প্রকার ধর্মশিক্ষা এর বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে থাকে। এগুলো একসাথে মিলে মণ্ডলীতে উপস্থিত, সক্রিয় ও বিশ্বস্ত খ্রীষ্টের প্রত্যাদেশ গঠন করে।

ধর্মশিক্ষার অন্যান্য উৎসের মধ্যে হচ্ছে উপাসনা, ঐশবাণী ও সাধু-সাধ্বীগণের জীবনের উপর আলোকপাত, প্রার্থনা ও সামাজিক ন্যায্যতা স্থাপক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন এবং খাঁটি খ্রীষ্টীয় জীবনের পক্ষে প্রাত্যহিক সাক্ষ্যদান।

৪। ধর্মশিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য

ধর্মশিক্ষার লক্ষ্য বিশ্বাসীগণকে খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীকে ঘিরে গভীর জ্ঞান ও প্রেম এবং তাঁর অনুসরণের দৃঢ় অঙ্গীকারের দিকে চালিত করা। যীশু খ্রীষ্ট সকল ধর্মশিক্ষার কেন্দ্রমূলে বিদ্যমান। এটা হচ্ছে, যীশুর সঙ্গে মিলন, যা সকল বিশ্বাসী পবিত্র ত্রিব্যক্তি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার রহস্যে সহভাগিতা করে।

ধর্মশিক্ষা একটি মাণ্ডলিক ক্রিয়া আর এটা মণ্ডলীর সমগ্র জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বাঁধা। ধর্মশিক্ষা সংস্কারসমূহ উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তুত করে, মাণ্ডলিক সমাজভুক্তকরণকে উৎসাহিত করে, প্রৈরিতিক কর্মকাণ্ড

ও প্রেরণ সাক্ষ্যদানের জন্য আহ্বান জানায়, খ্রীষ্টভক্তদের একতার জন্য আগ্রহ জাগিয়ে তোলে, আর একজনকে মাণ্ডলিক ভাব ও মণ্ডলীর প্রেরণদায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করে। মণ্ডলীই ধর্মশিক্ষার উৎস, ক্ষেত্র ও লক্ষ্য।

যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বিশ্বাসীদের একটি সমাজ গঠন করেছিলেন। তিনি তাঁদের শিক্ষা দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে প্রার্থনা করেছেন, তাঁদের দেখিয়েছেন কিভাবে বসবাস করতে হয়, আর তাঁদের উপর ন্যস্ত করেছেন ঐশরাজ্যের রহস্যাবলী। নিজের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর, তিনি তাঁদের নিকট প্রেরণ করেছেন পবিত্র আত্মাকে আর তাঁদের তিনি আদেশ দিয়েছেন সর্বত্র বেরিয়ে পড়ার এবং সকল জাতির মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার।

সুতরাং, ধর্মশিক্ষার মৌলিক কাজ হল, খ্রীষ্টের শিষ্যদের গঠন ক'রে তাদেরকে প্রেরণকাজে প্রেরণ। গুরু যীশুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে, ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করে নেয় ছয়টি ভিন্ন পরস্পর সম্পর্কিত কাজকে, যেমনটি 'খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষার সাধারণ নির্দেশনা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে :

৫.১) ধর্মশিক্ষা বিশ্বাস সম্পর্কিত জ্ঞান দান করে।

৫.২) ধর্মশিক্ষা উপাসনা অনুষ্ঠানে ও মণ্ডলীর সংস্কারীয় জীবনে অর্থবহ অংশগ্রহণ সম্ভব ক'রে তোলে।

৫.৩) ধর্মশিক্ষা নৈতিক গঠনকে খ্রীষ্টীয় জীবনধারার সঙ্গে সমন্বিত করে।

৫.৪) ধর্মশিক্ষা খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের শিক্ষা দেয় খ্রীষ্টের সঙ্গে, খ্রীষ্টেতে এবং মণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হয়ে কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়।

৫.৫) ধর্মশিক্ষা খ্রীষ্টানদের স্থানীয় মাণ্ডলিক সমাজের জীবনের সঙ্গে পরিচয় করে দেয় এবং মণ্ডলীর প্রৈরিতিক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে।

৫.৬) ধর্মশিক্ষা প্রৈরিতিক চেতনা গড়ে তোলে, যা সমাজে খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্যদানের জন্য খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের প্রস্তুত করে।

ধর্মশিক্ষার এই ছয়টি কাজ মিলে গঠিত হয় একটি সমগ্রতা। প্রতিটি কাজ ধর্মশিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়নে অবদান রাখলেও, এগুলোর সবই কিন্তু পরস্পরনির্ভর। তাই ধর্মশিক্ষার কার্যকারিতার লক্ষ্যে, একটি কাজকে অন্যান্য কাজ থেকে আলাদা করা উচিত হবে না।

৬। সংস্কৃত্যায়ন ও মঙ্গলসমাচারের বার্তা

যীশু খ্রীষ্ট, যিনি একটি বিশেষ কালে ও সংস্কৃতিতে জন্ম নেওয়া একজন বিশেষ মানুষ, তাঁতে ঈশ্বরের বাণী মানবরূপ লাভ করে। ঈশ্বর-পুত্রের দেহধারণের ঘটনা সংস্কৃত্যায়ন ও বাণীপ্রচারের জন্য ঐশ আদর্শ।

প্রতিটি সংস্কৃতিরই রয়েছে যুগ যুগ ধরে মণ্ডলী কর্তৃক ঘোষিত মঙ্গলসমাচারের বার্তাকে অভ্যর্থনা জানানোর ক্ষমতা। কার্যকারিতার লক্ষ্যে, বাণীপ্রচার দাবি করে মঙ্গলসমাচারের বার্তার সংস্কৃত্যায়ন। সংস্কৃত্যায়ন একটি পারস্পরিকভাবে সক্রিয় প্রক্রিয়া, যা একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে ঐশবাণীর প্রতিধ্বনি মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করে আর মঙ্গলসমাচারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মূল্যবোধ ও পালনীয়সমূহ নির্ধারণ করে, সুসমাচারের সঙ্গে বেমানান মূল্যবোধ ও পালনীয়সমূহ পরিশুদ্ধ করে আর সুসমাচারের পরিপন্থী কোন কিছুকে প্রত্যাখ্যান করে।

বহুসাংস্কৃতিক ও বহুত্ববাদী সামাজিক পরিস্থিতিতে, কার্যকর ধর্মশিক্ষা হচ্ছে 'সংস্কৃত্যায়িত ধর্মশিক্ষা' যেখানে ধর্মশিক্ষা বিষয়ক কর্মকাণ্ড এগুলোর করার চেষ্টা করে :

একটি সংস্কৃতিতে বিদ্যমান সুসমাচারের বীজগুলো আবিষ্কার করার

যাদের উদ্দেশ্যে সুসমাচার ঘোষিত হয় তাদের সংস্কৃতিকে সম্মান করার

স্বীকার করার যে, মঙ্গলসমাচারের বার্তা মানব সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতাগুলোর ঊর্ধ্বে

সেই রূপান্তরধর্মী মঙ্গলের কথা ঘোষণা করার, যা সুসমাচার প্রতিটি সংস্কৃতিতে সাধন করতে পারে।

সুসমাচারের জন্য নতুন আগ্রহ সৃষ্টি করার

ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিসমূহ গ্রহণ করার, যেগুলো মঙ্গলসমাচারের বার্তার প্রচার ও গ্রহণে অবদান রাখে

আপোসহীনভাবে বিশ্বাসের বিষয়বস্তু প্রাঞ্জলভাবে ও বিশ্বস্ততার সাথে প্রকাশ করার।

এই প্রক্রিয়ায় কাটেখিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি স্থানীয় সংস্কৃতির বাগধারায় মঙ্গলসমাচারের বার্তাকে বিশ্বস্ততার সাথে ব্যাখ্যা এবং বোধগম্য উপায়ে সহভাগিতা করার মাধ্যমে মণ্ডলীর উপর ন্যস্ত খ্রীষ্টের রহস্যাবলী গ্রহণকে এগিয়ে নেন।

পাঠ ৩

এই হল, আমাদের ধর্মবিশ্বাস ঃ এই হল, খ্রীষ্টমণ্ডলীর ধর্মবিশ্বাস

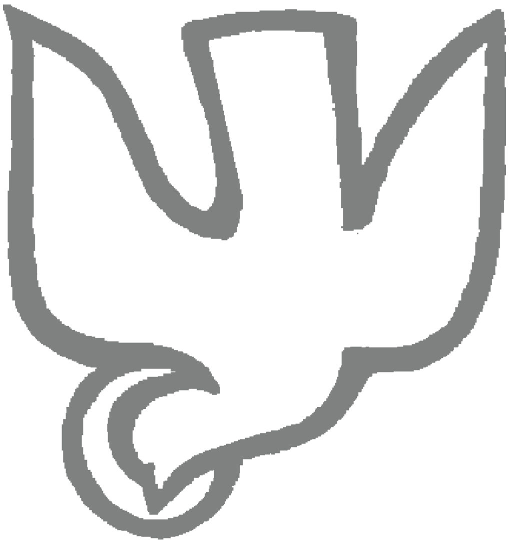

ধর্মবিশ্বাসের বিষয়বস্তু সমগ্র মণ্ডলীর সম্পদ। খ্রীষ্টের কথা ও কাজের স্মৃতি সংরক্ষণ এবং এই বিশ্বাসের বিষয়বস্তু ভাবী প্রজন্মের নিকট হস্তান্তর সমগ্র ঐশজনগণের জন্য যেমন সৌভাগ্য, তেমনি দায়িত্বও।

আমরা যে বিশ্বাস লাভ করেছি, তা প্রেরিতদূতদের কাছ থেকেই আমাদের নিকট এসেছে। যীশু তাঁদের উপর যে বিশ্বাস ন্যস্ত করেছিলেন, তা হস্তান্তরকালে প্রেরিতশিষ্য ও তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ ব্যবহার করতেন সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ বা বিশ্বাসমন্ত্র, যা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসকে সমন্বিত করে আর যা প্রণীত হয়েছে ধর্মশিক্ষার জন্য, বিশেষ করে দীক্ষাস্নান প্রার্থীদের জন্য।

১। বিশ্বাসের ঐকতান

মণ্ডলীর প্রতিটি যুগে, পবিত্র শাস্ত্রের অধ্যয়ন ধর্মশিক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে কাজ করেছে। বাইবেলীয় পাঠসমূহের ঘন ঘন, প্রত্যক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, আর সুসমাচার এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যেন তা খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্ককে অনুপ্রাণিত করে। "কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা" গ্রন্থ খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিশ্বাসের ও কাথলিক ধর্মতত্ত্বের একটি বিবৃতি, এটা পবিত্র শাস্ত্র, প্রৈরিতিক পরম্পরাগত শিক্ষা, আর খ্রীষ্টমণ্ডলীর শিক্ষাদানের ক্ষমতা দ্বারা প্রত্যায়িত বা এগুলোর আলোকে রচিত। ধর্মবিশ্বাস শিক্ষাদানে এটা একটি নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে কাজ করে।

২। খ্রীষ্টীয় বার্তার বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপনের মানদণ্ড

পবিত্র শাস্ত্রে ও ধর্মীয় পরম্পরাগত শিক্ষায় ঐশবাণীই খ্রীষ্টীয় বার্তা হস্তান্তরের একমাত্র উৎস। ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টকে আবর্ত ক'রেই খ্রীষ্টীয় বার্তার উপস্থাপনা। ধর্মশিক্ষার প্রতিটি দিক যীশুর অনুসরণকে উৎসাহিত করে। সুসমাচারগুলো হচ্ছে, ধর্মশিক্ষা বিষয়ক বার্তার কেন্দ্র। এগুলো হচ্ছে, ঈশ্বরের বাণী, যা মানব রচয়িতাগণ পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছেন।

সর্বদা ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর কেন্দ্রিক বলে, ধর্মশিক্ষা খ্রীষ্টীয় জীবনের কেন্দ্রিয় রহস্য হিসেবে পবিত্র ত্রিব্যক্তির উপর জোর দেয়। ঈশ্বর–যেমনটি দেহধারী বাণী যীশু প্রকাশ করেছেন– তাঁরা হচ্ছেন পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। সকল প্রত্যাদেশ পবিত্র ত্রিত্বের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, আর ধর্মশিক্ষার লক্ষ্য হল, পবিত্র ত্রিত্বের মিলন-বন্ধনে প্রবেশে সকলকে চালিত করা।

ধর্মশিক্ষায় পরিত্রাণের শুভ বার্তা অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয়ে ঘোষিত হবে। এই পরিত্রাণের মধ্যে অন্তর্গত একটি মুক্তির বার্তা : ব্যক্তিগত ও সামাজিক সব ধরনের পাপ থেকে মুক্তি। ধর্মশিক্ষার সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি যে, খ্রীষ্ট ঐশরাজ্য সূচিত করেছেন, যার

মণ্ডলী হচ্ছে বীজ ও সূচনা। মণ্ডলীর আশ্রয়ে ও মাধ্যমে আমরা এখানে পৃথিবীতে ঐশরাজ্যের বিভিন্ন দিক অভিজ্ঞতা করতে এবং শাশ্বত স্বর্গরাজ্যের পূর্বস্বাদ আস্বাদন করতে পারি।

হস্তান্তরিত হয়ে আসা বিশ্বাস যেহেতু খ্রীষ্টমণ্ডলীরই বিশ্বাস, তাই ধর্মশিক্ষা সব সময় একটি মাণ্ডলিক কার্যক্রম। খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিশ্বাস আমরা লাভ করেছি প্রেরিতশিষ্যদের মাধ্যমে খ্রীষ্টের কাছ থেকে; এ বিশ্বাস শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ, উপাসনায় উদ্‌যাপিত, আর যুগ যুগ ধরে মণ্ডলীর শিক্ষাকর্তৃপক্ষের শিক্ষায় এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিশ্বাসীবর্গের সাক্ষ্যদানে প্রকাশিত। ধর্মশিক্ষা শুরু হয় খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিশ্বাস ঘোষণা দিয়ে আর এর লক্ষ্য হল, বিশ্বাসীবর্গের ধর্মবিশ্বাসের স্বীকারোক্তি।

খ্রীষ্টীয় বার্তার মাণ্ডলিক বৈশিষ্ট্য এর ঐতিহাসিক প্রকৃতি এবং প্রভুর প্রেরণকাজকে এগিয়ে নেওয়ার মণ্ডলীর ভূমিকাকেই নির্দেশ করে। যীশু খ্রীষ্ট এমন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, যিনি আসন্ন ঐশরাজ্যের শুভ বার্তা ঘোষণা করেছেন। প্রতিটি প্রজন্মে তাঁর উপস্থিতি ও তাঁর প্রেরণকাজ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে তিনি মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই মণ্ডলী কথা ও চিহ্নের মাধ্যমে খ্রীষ্টকে এমনভাবে প্রকাশ অব্যাহত রাখে, যার ফলে তাঁর প্রজ্ঞা ও শিক্ষাকে আজকের পরিবেশ-পরিস্থিতিতে প্রয়োগ সম্ভব হয়, আরও অব্যাহত রাখে মানব ইতিহাসের বর্তমান ঘটনাবলী ব্যাখ্যা।

খ্রীষ্টীয় বার্তার পালকীয় উপস্থাপনায় সুসমাচারের সংস্কৃত্যায়ন একটি প্রধান মানদণ্ড। মাণ্ডলিক সমাজ যেহেতু সংস্কৃত্যায়নের প্রধান ক্ষেত্র, তাই ধর্মপল্লী অবশ্যই কাটেখিষ্টদের তাদের স্থানীয় ভাষায় ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে গড়ে তুলবে; সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন পদ্ধতি, উপকরণ, পুস্তক আর সহায়ক মাধ্যমসমূহের ব্যবহার ঘটাবে; সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার উপর আলোকপাতকারী ধর্মীয় নেতৃত্বকে উৎসাহ যোগাবে; ধর্মপল্লীর মধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলের নিকট অভিন্ন বা প্রচলিত লৌকিক ধর্মাচার ও পালা-পার্বণে অংশগ্রহণ করবে।

ধর্মশিক্ষা অধিকন্তু খ্রীষ্টীয় বার্তার শ্রেণীবিন্যাসগত বৈশিষ্ট্য স্বীকার করে নেবে ও এ সম্পর্কে শিক্ষা দেবে।

পরম পবিত্র ত্রিত্বের রহস্য খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস ও জীবনের কেন্দ্রিয় রহস্য আর তাই এটা সকল ধর্মশিক্ষার সর্বাপেক্ষা মৌলিক ও অত্যাবশ্যকীয় দিক। বিশ্বাসের সত্যগুলোর মধ্যে যখন একটি আঙ্গিক বা মিলধর্মী ঐক্য বিদ্যমান, তখন অন্যান্য সত্যগুলো এ মৌলিক সত্যগুলোকে ঘিরে সংগঠিত হয় : পবিত্র ত্রিত্ব, দেহধারণ, পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ও কাজ এবং খ্রীষ্টের দেহরূপ মণ্ডলীর রহস্য।

খ্রীষ্টীয় বার্তা উপস্থাপনার সর্বশেষ মানদণ্ডটি হল, এর উচিত এমন একটি অভিন্ন বিশ্বাসের ভাষাকে অনুপ্রাণিত করা, যার ফলে ধর্মবিশ্বাসকে সকল বিশ্বাসীবর্গের নিকট পরিচিত ভাষায় ঘোষণা, উদ্‌যাপন, জীবনযাপন, প্রার্থনা করা সম্ভব হবে। বিশ্বাসের বাইবেলীয় ভাষা ও মন্ত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ শুধুমাত্র এগুলো যে বাস্তবতাসমূহ প্রকাশ এবং যে স্বকীয়তা অনুপ্রাণিত করে সে কারণে। পরম্পরাগত সূত্রসমূহের সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা এমন ভাষায় ব্যাখ্যা করতে হবে, যা যাদেরকে উদ্দেশ্য করে এটা প্রদত্ত হচ্ছে, তাদের অর্থাৎ জনগণ ও সংস্কৃতির উপযোগী হবে।